তৃতীয় অধ্যায়

-: জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা সম্প্রদায় ও ভাষিক পরিস্থিতি :-

প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমনে জলপাইগুড়ি জেলার জনমন্ডলী যেমন একটি সমন্বিত বা মিশ্ররূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তেমনি বহুবিধ ভাষা-গোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থান, সংবাদ-বিনিময় ও পারস্পরিক প্রভাবে এই জেলার ভাষাগত পরিবেশও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যেসব নর-গোষ্ঠী এই জেলায় বিভিন্ন সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাদের অনেকেরই নিজস্ব মাতৃভাষা আছে। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় মোট একশ একান্নটি মাতৃভাষার অস্তিত্ব আছে বলে ১৯৬১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এদের মধ্যে আটটি ভাষা বিদেশী এবং বিয়াল্লিশটি ভাষার বর্গীকরণ (classi-fication) করা সম্ভব হয় নি, অবশিষ্ট একশ-একটি ভাষা ভারতে প্রচলিত চারটি প্রধান ভাষা পরিবারের (ভারতীয় আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোট-বর্মী) অন্তর্ভুক্ত। শতাধিক মাতৃভাষার ধারক হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলাকে একটি 'বহুভাষা-ভাষী জেলা'রূপে (Multi-lingual district) গ্রহণ করা যায়। অবশ্য বাচক সংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকে সবগুলি ভাষার গুরুত্ব সমান নয়। ১৯৭১ সালের জনগণনায় অবশ্য জলপাইগুড়ি জেলার মাতৃভাষার সংখ্যা ১৯৬১ সালের জনগণনা থেকে অনেক কম দেখান হয়েছে। ১৯৬১ সালের জনগণনায় বিভিন্ন মাতৃভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয় নি। ১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্যাদি এখনও প্রকাশিত হয় নি। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন মাতৃভাষাগুলির বাচক সংখ্যা নিম্নরূপ :-[২]

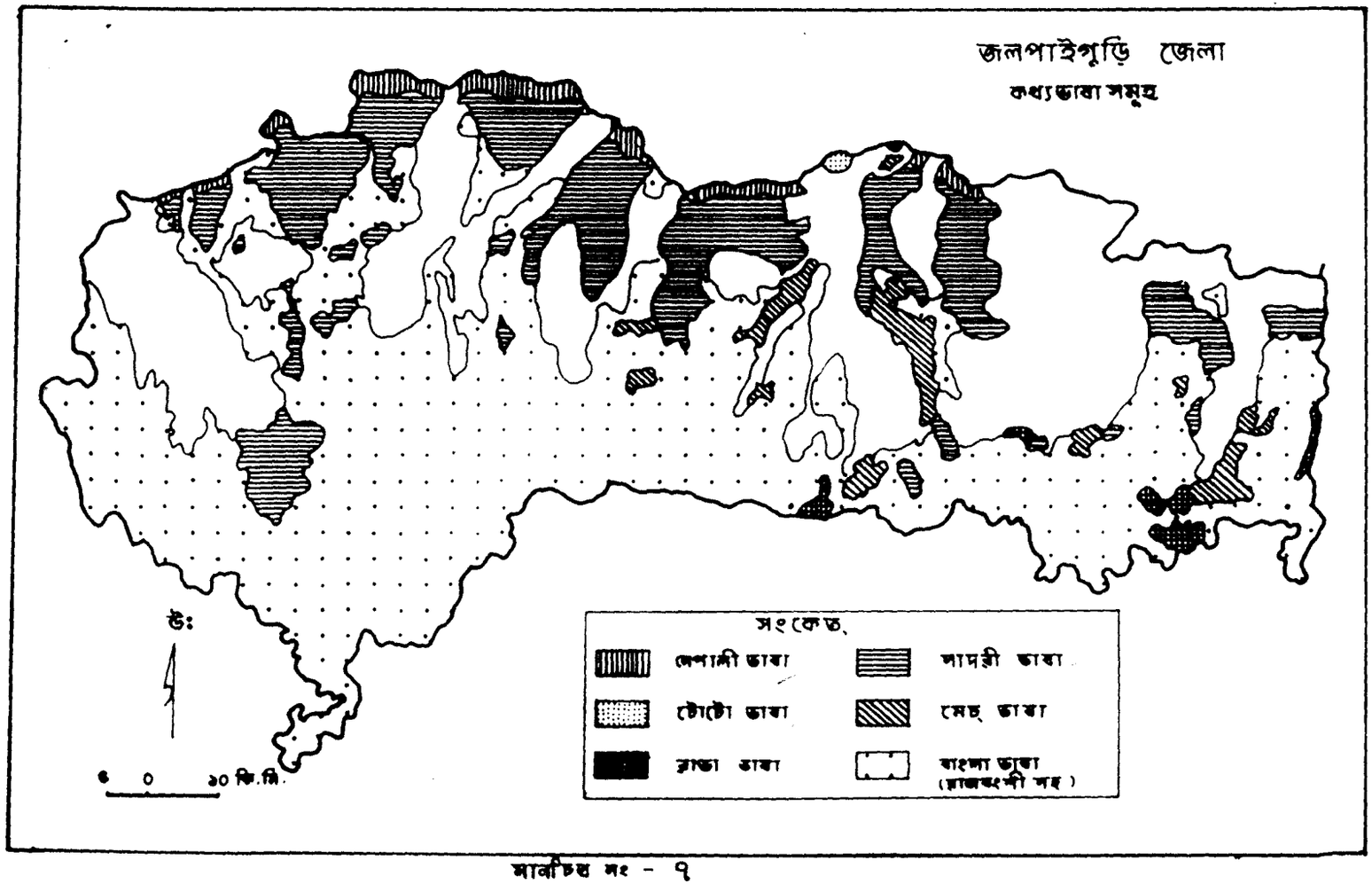

জলপাইগুড়ি জেলা
কথ্যভাষা সমূহ
সংকেত
নেপালী ভাষা
সাদরী ভাষা
টোটো ভাষা
মেচ ভাষা
রাভা ভাষা
বাংলা ভাষা (রাজবংশী সহ)
উঃ
৫ ০ ১০ কি.মি.

মানচিত্র নং - ৭

ভাষা-গোষ্ঠীর নাম	বাচক সংখ্যা
ক. ভারতীয় আর্যভাষা পরিবারভুক্ত ভাষা সমূহ :	
১. বাংলা	১, ০৫৪, ২৫৫ জন
২. হিন্দী (রাজস্থানী, ভোজপুরী, মৈথিলী, হিন্দুস্থানী, মালপাহাড়ী, মগদেশী, সাদরী, ইত্যাদি ভাষা সহ)	২৭২, ৭৬৫ জন
৩. নেপালী / গোর্খালী	১২৮, ৭৬৫ জন
৪. ওড়িয়া	১, ২৭১ জন
৫. উর্দু	৪, ৩৬৫ জন
৬. পাঞ্জাবী	১, ৪০১ জন
৭. অসমীয়া	৮৮৭ জন
৮. গুজরাটী	১৭১ জন
৯. মারাঠী	১২৭ জন
১০. সিন্ধী	৩৬ জন
১১. কাশ্মিরী (দরদীয় গোষ্ঠীভুক্ত)	১৮ জন
১২. ডোগ্‌রী	১১ জন
১৩. কোঙ্কনী	৫ জন
১৪. লাহ্‌ন্দা	২ জন
খ. অষ্ট্রিক ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষা সমূহ :-	
১. মুণ্ডা	৪০, ৪৫২ জন
২. সাঁওতালী	৩৭, ৮৭৭ জন

ভাষা-গোষ্ঠীর নাম	বাচক সংখ্যা
৩. খারিয়া	১৩, ৮৪৪ জন
৪. শবর	১, ৩২২ জন
৫. ভূমিজ	৪২৮ জন
৬. মুণ্ডারী	৪১৮ জন
৭. হো	৩৮২ জন
৮. কোড়া	২১ জন

গ. দ্রাবিড় ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষাসমূহ :-

১. কুরুখ-ওঁরাও	১৪৪, ৭৮০ জন
২. কয়া	৭১৩ জন
৩. কিসান্	১৫০ জন
৪. খোন্দ্ বা কোন্দ	৫৫ জন
৫. তেলেগু	১৫১ জন
৬. তামিল	২৯৩ জন
৭. গোন্দী	৩৪১ জন
৮. মালয়ালম	২৬৭ জন
৯. কানাড়া	৩৭ জন

ঘ. ভোট-বর্মী ভাষা পরিবার ভুক্ত ভাষা সমূহ :-

১. মেচ / বোড়ো	২০, ১৬২ জন
২. রাভা	৬, ৫৭৮ জন

ভাষা-গোষ্ঠীর নাম	বাচক সংখ্যা
৩. ভোটিয়া	২,৫৭৩ জন
৪. টোটো	৬৭১ জন
৫. গারো	৩১৫ জন
৬. লাদাক	৫৩ জন
৭. কোচ	৩০ জন
৮. খিজো / লুসা	৩ জন

এই পরিসংখ্যান গুলি যদিও দুই দশক পূর্বের এবং ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯৭১ সালের মধ্যে ২৩.১৭ শতাংশ এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ২৫.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি বলা যায় জেলার জনবিন্যাস এবং ভাষিক পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ভাষার বাচক সংখ্যাও বেড়েছে, অনুমান করা যায়। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলা থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু বাঙালীর আগমনের ফলে বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। তবে সাধারণ ভাবেই জলপাইগুড়ি জেলায় অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা বৃদ্ধির হার যে অনেক বেশি, তা ১৯৬১ সাল ও ১৯৭১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান থেকেই প্রমাণিত হয়। এই দশকে বাংলা ভাষা ভাষীর আনুপাতিক হার যেখানে ৫৪.৮৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬০.২৩ শতাংশ হয়েছে, সেখানে অন্যান্য ভাষার মোট বাচক সংখ্যা বাড়লেও আনুপাতিক হার কমেছে। ১৯৬১ সালে এই জেলায় কুরুখ-ওঁরাও ভাষা-ভাষীর আনুপাতিক হার যেখানে ছিল ১১.১১ শতাংশ, সেখানে ১৯৭১ সালে তা কমে গিয়ে ৮.২৮ শতাংশ হয়েছে। নেপালী ভাষার আনুপাতিক হারও ১৯৬১ সালের ৮.৩১ শতাংশ থেকে ১৯৭১ সালে কমে ৭.৩৫ শতাংশ হয়েছে। ১৯৬১ সালে হিন্দী ও সাদরী ভাষার বাচক সংখ্যার আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে

৭.১১ শতাংশ এবং ৫.৬৬ শতাংশ। ১৯৭১ সালে হিন্দী-ভাষীর আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৫৫ শতাংশ হয়েছে, কিন্তু সাদরী-ভাষীর সংখ্যা পৃথকভাবে দেখান হয় নি। এই জনগণনায় সাদরী-ভাষীদের সম্ভবত হিন্দী ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ সাদরী-ভাষীরা অনেকেই নিজেদের হিন্দী ভাষা-ভাষী বলে দাবী করে থাকেন। সুতরাং এই জেলায় বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা বৃদ্ধির হার যে অন্যান্য ভাষার বাচকসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে অনেক বেশি, তা বলা যায়।[৩]

বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর বাচক সংখ্যা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলায় এক লক্ষ বা তাতোধিক ব্যক্তির মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত ভাষা মাত্র চারটি। এই চারটি ভাষা হল, যথা-ক্রমে বাংলা, হিন্দী, কুরুখ্-ওঁরাও এবং নেপালী। কুড়ি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত বাচক সংখ্যা বিশিষ্ট ভাষা তিনটি - মুন্ডা, সাঁওতালী এবং মেচ। 'খারিয়া' ভাষার বাচক সংখ্যা দশ হাজার থেকে কুড়ি হাজারের মধ্যে। পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত ব্যক্তির মাতৃভাষা দুটি, - ওড়িয়া এবং রাভা। ওড়িয়া ভাষীরা অধিকাংশই এই জেলার অস্থায়ী অধিবাসী, জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা এই জেলায় সাময়িক ভাবে বসবাস করেন। রাভা ভাষা-ভাষীরা অধিকাংশই বনবস্তীতে বাস করেন। এঁদের কিছু অংশ অবশ্য গ্রামেও বসবাস করেন। গারো ভাষা-ভাষীরাও মূলতঃ বনবস্তীবাসী। এই ভাষার বাচক সংখ্যা পাঁচশ জনেরও কম। টোটো ভাষার বাচক সংখ্যাও এক হাজারের কম। টোটো ভাষীরা একটি বিরল উপ-জাতি, জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থানার টোটোপাড়া গ্রামেই এঁরা বসবাস করেন। অন্যত্র টোটোদের বসতি নেই। মেচ ভাষীরাও প্রধানত পশ্চিম-ডুয়ার্সের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাচক সংখ্যার দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার উল্লেখযোগ্য মাতৃ ভাষা হল - বাংলা, হিন্দী, কুরুখ-ওঁরাও, নেপালী, মুন্ডা, সাঁওতালী, মেচ ইত্যাদি ভাষাগুলি। এদের

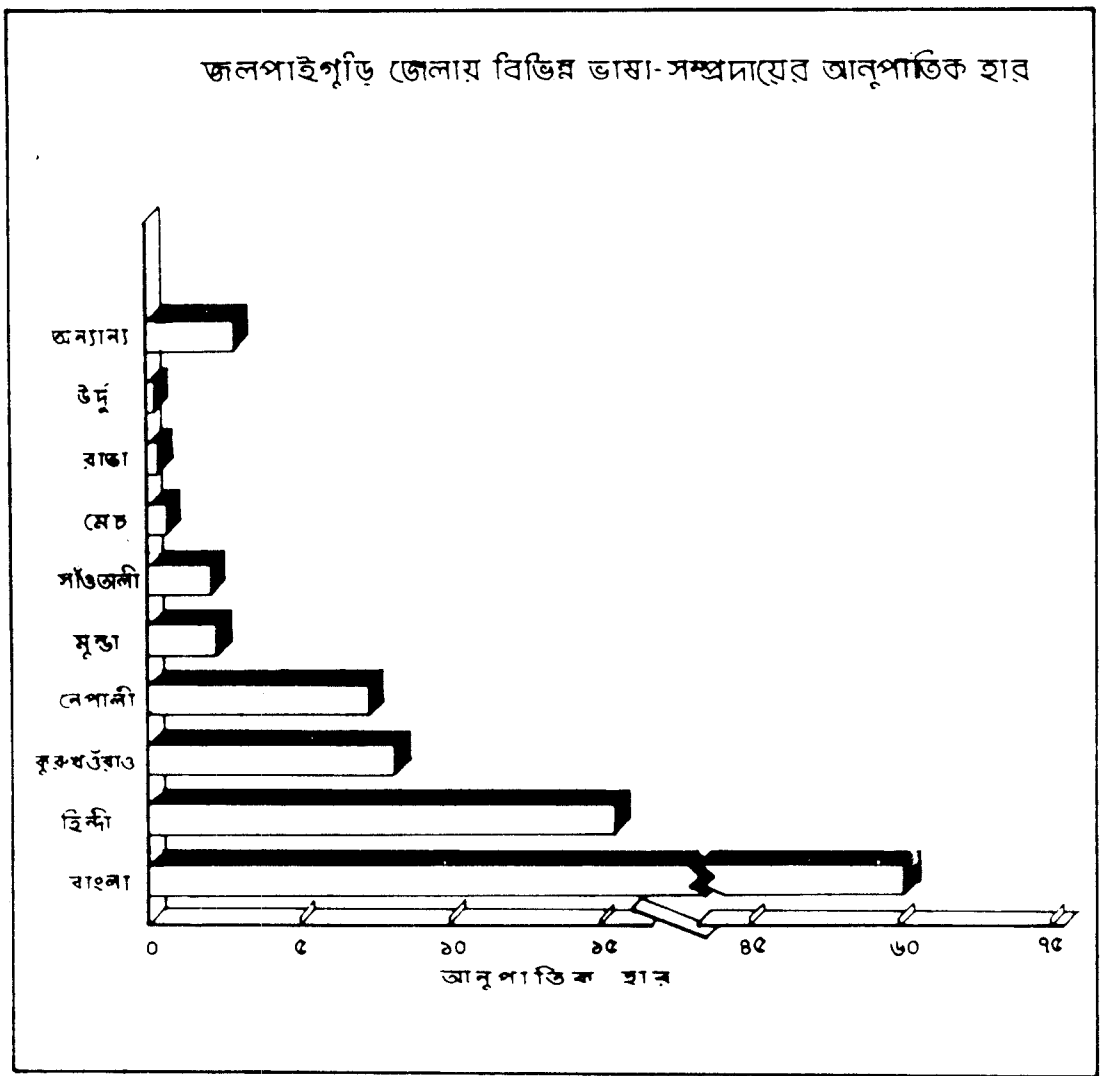
জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার
অন্যান্য
উর্দু
রাভা
মেচ
সাঁওতালী
মুন্ডা
নেপালী
কুরুখওঁরাও
হিন্দী
বাংলা
0
৫
১০
১৫
৪৫
৬০
৭৫
আনুপাতিক হার

চিত্র নং - ১

মধ্যে বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকেও এই ভাষাই প্রধান। বাচক সংখ্যার দিক থেকে হিন্দী দ্বিতীয় প্রধান মাতৃভাষা। কিন্তু সাদরী ভাষা ভাষীদেরও সম্ভবত হিন্দী ভাষা ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা হয়েছে। সাদরী ভাষীদের পৃথকভাবে ধরলে এই জেলার প্রকৃত হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যাবে। নেপালী ভাষা-ভাষীরা প্রধানত চা বাগান অঞ্চলের অধিবাসী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জেলায় চা-শিল্প পত্তনের সময় থেকেই শ্রমিকের কাজে নেপালীদের আগমন ঘটে। বর্তমানে চা বাগানগুলিতে, বিশেষত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চা-বাগানগুলিতেই অধিকাংশ নেপালী ভাষা-ভাষীরা বাস করেন। কুরুখ্-ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতালী, খারিয়া, নাগেশিয়া, শবর, প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীগুলিও প্রধানত চা-বাগান অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত।

চা-বাগানগুলির শ্রমিক-চাহিদা পূরণের জন্য তিন থেকে পাঁচ পুরুষ আগে ছোটনাগপুর মালভূমি ও বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে এঁদের আগমন ঘটেছিল। সেই সময় থেকে কয়েক পুরুষ ধরে এঁরা চা-বাগান অঞ্চলেই বসবাস করছেন। তবে চা-বাগান থেকে অবসর নেওয়ার পর কিংবা চা-বাগানে কাজ না পেয়ে এদের একাংশ গ্রামাঞ্চলেও বসবাস করে থাকেন। আদিবাসী চা-শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা থাকলেও, সেই ভাষাগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছে বোধগম্য নয়। তার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে সাদরী ভাষা ব্যবহৃত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন মাতৃভাষাগুলির মধ্যে যেগুলির বাচক-সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশি, ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তাদের থানা-ভিত্তিক বাচক সংখ্যা নিম্নরূপ :- [৪]

থানা	বাংলা	হিন্দী	নেপালী	কুরুখ-ওঁরাও	মুন্ডা	সাঁওতালী	বোড়ো বা মেচ
জলপাইগুড়ি	২৩২, ০৪৪	৩০, ৬০৬	৩, ১১৮	৩, ১৭৬	৭৩৪	৮৭৫	X
রাজগঞ্জ	১০৬, ২৪৮	১১, ৫১৪	৫, ৬৮০	২, ৪৩১	৫৩২	১, ২৬৪	১০০
মাল	৭১, ৬১৮	৩৬, ৫৭০	১০, ১৩৩	২৮, ৫৬১	৫, ৬৬৬	৭, ১১৩	৪২৮
মেটেলী	৮, ৭৩১	২১, ০৬৭	১, ৫৬৩	১০, ৩৭২	৪, ৫৬৩	২, ৮০৮	X
ময়নাগুড়ি	১৭২, ৫৬৩	৬, ৮০৭	১, ৩৪২	X	১৩১	৫৪৮	২০৫
নাগরাকাটা	১, ১৮১	২৩, ০১৪	১০, ৪৪৪	১২, ৫৩০	৪, ৮২৫	৩, ৪৪১	২৫৪
ধূপগুড়ি	১৪৫, ০৪৭	৪৫, ২১০	১৩, ৬২৬	১৫, ৬৫৭	৪, ৬৬৮	২, ৮১১	২৬২
বীরপাড়া	৬, ৭৫৬	১২, ৩২১	১১, ২৬৫	১১, ৫৮১	১, ৭৭৭	১, ১১৪	X
ফালাকাটা	১০২, ৩৪৫	১৫, ০৬১	১, ৪১৭	৮, ০২৮	৩, ২৭৪	৩, ০১৮	১, ৭৭৩
মাদারীহাট	১৩, ২৪১	১০, ৭৬২	৮, ১৪৭	৪, ২৮৪	১০৫	৩৮৬	১, ৭৫১
কালচিনি	১৬, ০৭৬	৪০, ১৪১	৩২, ৬০১	১৬, ১২৩	৬, ২৪১	২, ৪১৪	৪, ৭৫১
আলিপুরদুয়ার	২১৫, ০২৬	৩৭, ৩৭৮	৫, ৫১৫	১৫, ৬৫২	৪, ১৩১	১০, ৭২৩	৫, ১৬৬
কুমারগ্রাম	৪১, ৫৩৬	১৪, ১৫২	৬, ০১১	১৫, ৪২৮	২, ২৬৩	৬৩৭	৫, ১৭৮

জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলির থানাভিত্তিক বাচক সংখ্যার পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষাই এই জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠির মাতৃভাষা এবং এই জেলার প্রায় সর্বত্রই বাংলা ভাষীরা বাস করেন। কিন্তু সবগুলি থানা অঞ্চলেই বাংলা ভাষা ভাষী-দের সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই। কোনো কোনো থানা এলাকায় হিন্দী, নেপালী বা কুরুখ-ওঁরাও ভাষাগুলির বাচক সংখ্যা বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা থেকে বেশি। যে থানাগুলিতে বাংলা ভাষা-ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলি হল - জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ (ভক্তিনগর থানা সহ), মাল, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মাদারীহাট ও আলিপুরদুয়ার। অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে বীরপাড়া থানায় নেপালী ভাষা-ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মেটেলী, নাগরাকাটা, ও কালচিনি (জয়গাঁ থানা সহ) থানায় হিন্দীভাষীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ (এখানে হিন্দী ভাষার বাচক গোষ্ঠীতে সাদরী ভাষার বাচক গোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত)। হিন্দী ভাষা দ্বিতীয় বৃহত্তম মাতৃ-ভাষা রূপে কথিত হয় - জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ (ভক্তিনগর সহ), ময়নাগুড়ি, ধূপ-গুড়ি, বীরপাড়া, ফালাকাটা, মাদারীহাট, ও আলিপুরদুয়ার থানাগুলিতে। কুরুখ-ওঁরাও ভাষা দ্বিতীয় বৃহত্তম মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় মেটেলী, নাগরাকাটা ও কুমারগ্রাম থানায় এবং তৃতীয় বৃহত্তম মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয় মাল, ধূপগুড়ি, বীরপাড়া, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার থানা এলাকায়। মেটেলী, নাগরাকাটা, বীরপাড়া ও কালচিনি (জয়গাঁ থানা সহ) থানাগুলিতে বাংলা ভাষার বাচক সংখ্যা হিন্দী, নেপালী ও কুরুখ-ওঁরাও ভাষা-গুলির বাচক সংখ্যা থেকে কম। চার হাজার থেকে সাত হাজারের মধ্যে মুন্ডা ভাষা-ভাষীরা বাস করেন কালচিনি, মাল, ফালাকাটা, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, মেটেলী প্রভৃতি থানাগুলিতে। অন্যান্য থানায় মুন্ডা ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও কম। দশ হাজার থেকে বেশি সংখ্যক সাঁওতালী ভাষা-ভাষী বাস করেন আলিপুরদুয়ার থানায়, সাত হাজার সাঁওতালী ভাষা-ভাষী বাস করেন মাল থানায়। অন্যান্য থানা অঞ্চলে সাঁওতালী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের নীচে। পাঁচ হাজারের বেশি মেচ বা বোড়ো ভাষা-ভাষী বাস করেন আলি-পুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম থানায়। কালচিনি থানা এলাকায় মেচ ভাষা-ভাষীর সংখ্যা প্রায়

পাঁচ হাজার। অন্যান্য থানায় মেচ ভাষা-ভাষীর সংখ্যা দু হাজার থেকেও কম।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর থানা-ভিত্তিক বাচক সংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানতঃ গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই বাস করেন। চা বাগান অঞ্চলে বাংলা ভাষা-ভাষীরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ। হিন্দী ভাষা-ভাষীরাও প্রধানত জেলার শহরাঞ্চলে ও চা বাগান অঞ্চলেই বসবাস করেন। সাদরী ভাষার বাচক গোষ্ঠীও মূলতঃ চা-শ্রমিক। নেপালী, কুরুখ-ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতালী ইত্যাদি ভাষাগুলির বাচকরা অধিকাংশই চা-বাগান অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। চা-বাগান অঞ্চলে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণ, এই জেলার চা বাগানগুলি অধিকাংশই পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত। প্রাক্-বৃটীশ যুগে এই পশ্চিম ডুয়ার্স ছিল চিরহরিৎ বনভূমির দ্বারা পরিপূর্ণ জনবিরল অঞ্চল। সেই সময় এখানে বাস করতেন কোচ, মেচ, খারু, রাভা, গারো, টোটো প্রভৃতি 'ইন্দো-মোঙ্গলীয়' জাতির বিভিন্ন নরগোষ্ঠী। জঙ্গল পরিষ্কার করে চা-বাগান-গুলি প্রতিষ্ঠার পরে থেকেই ডুয়ার্স অঞ্চলে জনসমাগম বাড়তে থাকে। প্রধানত চা-শিল্পকে কেন্দ্র করেই এই জনসমাগম ঘটে। চা-বাগানগুলির শ্রমিক-চাহিদা পূরণের জন্য যেমন বাইরে থেকে নেপালী ও বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতির আগমন ঘটে, তেমনি প্রশাসনিক, করণিক ও শিক্ষকতার প্রয়োজনে বাঙালীরাও এসে উপস্থিত হন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই মধ্যবিত্ত বাঙালীদের সংখ্যা নেপালী ও আদিবাসী শ্রমিকদের থেকে অনেক কম হওয়ায় চা-বাগান অঞ্চলে বাঙালীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। পরবর্তীকালে, স্বাধীনতা-লাভের সময় দেশ বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে দলে দলে শরনার্থীদের আগমন ঘটলেও, চা-বাগানে তাঁদের পুর্নবাসন খুব বেশি হয়নি। তাঁরা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে অথবা গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। ফলে চা-বাগান অঞ্চলে নেপালী ও আদিবাসী জনজাতির শ্রমিকদের তুলনায় বাঙালীর সংখ্যা কম।

১৯৭১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে হিন্দী, নেপালী, কুরুখ, মুণ্ডা, সাঁওতালী ইত্যাদি ভাষা-ভাষীদের প্রাধান্য থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে চা-বাগান অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে হিন্দী, বাংলা ও আদিবাসী ভাষাগুলির উপাদানে সমৃদ্ধ একটি 'ঐক্য বিধায়ক' ভাষাই বেশি প্রচলিত। এই ভাষাটি 'সাদরী' বা 'সাদানী' ভাষা নামে পরিচিত। এই সাদরী ভাষা আদিবাসী জনজাতির চা শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের প্রধান ভাষা-মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই ভাষাই হয়ে উঠেছে জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষা (Lingua Franca)। আদিবাসী শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যাদের নিজস্ব মাতৃভাষা নেই, সাদরী তাদের কাছে প্রথম ভাষা এবং যাদের নিজস্ব মাতৃভাষা আছে, সাদরী তাদের কাছে দ্বিতীয় মাতৃভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে।[৫] ১৯৬১ সালের জন গণনায় জলপাইগুড়ি জেলায় সাদরী ভাষা ব্যবহারী ব্যক্তির মোটসংখ্যা ছিল ৭৬,৬১০ জন। কিন্তু ১৯৭১ সালের জনগণনায় এই জেলায় সাদরী ভাষীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমানে সাদরী ভাষার প্রকৃত বাচকসংখ্যা কতজন, তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

তবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রমান থেকে অনুমান করা যায় যে, এই জেলায় সাদরী ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীই সম্ভবত বাংলা ভাষার পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী। ১৯৬১ সালের জনগণনায় হিন্দী ও সাদরী ভাষা-ভাষীর আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৭.১১ ভাগ এবং ৫.২১ ভাগ। ১৯৭১ সালের জনগণনায় সাদরী ভাষীর সংখ্যা পৃথকভাবে দেখানো হয় নি, কিন্তু হিন্দী ভাষীর আনুপাতিক হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৫৫ ভাগ। সুতরাং ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না যে, হিন্দীভাষা-ভাষী রূপে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশই সাদরী ভাষা-ভাষী। কারণ ১৮৬১ সালের জনগণনায় হিন্দী ও সাদরী ভাষার বাচক সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ১.৪৮ ভাগ। হিন্দী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত-

সাদরী ভাষীরা ছাড়াও, কুরুখ-ওঁরাও, মুণ্ডা, খারিয়া, সাঁওতালী, নাগেশিয়া, হো, প্রভৃতি গোষ্ঠী ভাষাগুলিকে যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা রূপে দাবী করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনে সাদরী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা পূর্বপুরুষদের মাতৃভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা রূপে উল্লেখ করতে গৌরব অনুভব করেন, কারণ "মানুষের সঙ্গে তার ভাষার সম্পর্ক এমনই নিবিড় যে, এক এক জনগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্বের পরিচয় খোঁজে ভাষার মাধ্যমে ... ।" [৬] তাছাড়া আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে আদিবাসী জনজাতির লোকেরা নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠছেন এবং সেই আত্ম-সচেতনতার অন্যতম প্রকাশ হল, পূর্বপুরুষদের মাতৃভাষা সম্পর্কে মমতা ও গৌরববোধ। কিন্তু নিজেদের পূর্ববর্তী গোষ্ঠী-ভাষাগুলি, সম্পর্কে মমতা ও গৌরববোধ থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী চা-শ্রমিকদের অধিকাংশই সেই সব গোষ্ঠীভাষা প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন, এবং খুব কম ব্যক্তিই মুণ্ডা, কুরুখ-ওঁরাও, সাঁওতালী, নাগেশিয়া ইত্যাদি মাতৃভাষাকে বিশুদ্ধভাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বাক্ বিনিময়ের সময় বাংলা-হিন্দী মুণ্ডা ইত্যাদি ভাষা মিশ্রিত সাদরী ভাষা ব্যবহার করেন এবং বাইরের লোকের সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। [৭] জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা-বাগানের আদিবাসী জনজাতির ব্যবহৃত কথ্য ভাষা-সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমান প্রজন্মের চা-শ্রমিকরা পূর্ববর্তী গোষ্ঠীভাষাগুলিকে নিজেদের মাতৃভাষা রূপে ঘোষণা করতে শ্লাঘা অনুভব করলেও, তাঁরা অধিকাংশই সেইসব গোষ্ঠীভাষাগুলি প্রায় ভুলে গিয়েছেন এবং সাদরী ভাষাতেই তাঁরা অধিকতর স্বচ্ছন্দ। এই ভাষাই হয়ে উঠেছে তাঁদের পরস্পর বাক্ বিনিময়ের প্রধান ভাষা-মাধ্যম। প্রবীন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ মোটামুটিভাবে নিজেদের গোষ্ঠীভাষাগুলি জানলেও, তাঁদের সন্তান সন্ততিরা মূলত সাদরী ভাষী। কয়েক পুরুষ আগে বর্তমান চা-শ্রমিকদের পূর্বপুরুষরা চা-বাগান অঞ্চলে এসে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে

বসবাস শুরু করার পর থেকেই মু-ভূমির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মগুলির সঙ্গে মু-ভূমির যোগাযোগ খুবই কম। এই যোগাযোগ যত কমেছে, পূর্ববর্তী গোষ্ঠীভাষার প্রভাবও তত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তার ফলে তাদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, সেই শূন্যতা ভরাট হয়েছে সাদরীভাষা ও স্থানীয় বাংলা ভাষার দ্বারা। বর্তমান প্রজন্মের আদিবাসী শ্রমিকরা যে ভাষাগত পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাতে সাদরী ভাষা ও বাংলা ভাষার প্রভাব পূর্ববর্তী গোষ্ঠীভাষাগুলি থেকে অনেক বেশি। ফলে পূর্ববর্তী মাতৃভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষা সাদরীই হয়ে উঠেছে চা-শ্রমিকদের প্রধান সংবাদ-বিনিময়ের ভাষা।[৮] সুতরাং হিন্দী ভাষীর প্রায় ৪০ শতাংশ এবং কুরুখ-ওঁরাও মুন্ডা, সাঁওতালী, খারিয়া, নাগেশিয়া ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশকে সাদরী ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী হিসাবে ধরলে জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান অঞ্চলের প্রধান কথ্যভাষারূপে সাদরী ভাষাকেইগ্রহন করা যায়।

সাদরী ভাষার উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে পরস্পরবিরোধী অভিমত পাওয়া যায়। আসাম ও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকদের পূর্ব-পুরুষরা, যাঁরা প্রায় শতবর্ষ পূর্বে মু-ভূমি থেকে চা-বাগানগুলিতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা এখানে আসার আগেই মু-ভূমিতে সাদরী ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, না এখানে আসার পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরস্পর বাক্-বিনিময়ের জন্য সাদরী ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, এ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কারো কারো মতে নাগাল্যান্ডের 'নাগামীজ' (Nagamese) এবং অরুনাচলের 'নেফামীজ' (Nefamese) ভাষার মতোই সাদরী ভাষাও কাজ চালানো গোছের একটি কৃত্রিম মিশ্রভাষা (Mixed language) বিভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী চা-শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেই এই ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।[৯] কারো কারো মতে সাদরী ভাষা 'হিন্দী' বাংলা এবং সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষার ওপভাষিক উপাদানের খিঁচুড়ি'।[১০] 'হ্যান্ডবুক অন্ সিডিউল্ড্ কাস্টস্ এন্ড্ সিডিউল্ড্ ট্রাইবস্ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল' গ্রন্থে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন

উপজাতির পরিচয় দিতে গিয়ে মুণ্ডা, নাগেশিয়া, ওঁরাও, সাঁওতাল, খারিয়া ইত্যাদি আদি অষ্ট্রাল ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আদিবাসীদের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এদের অধিকাংশই বাংলা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার উপাদানে গঠিত 'মিশ্র ভাষা' সাদরীতে কথা বলেন।[১১] সাধারণত দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী যখন ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক কারণে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে থাকতে বাধ্য হয়, তখন বিভিন্ন বাক্-গোষ্ঠীর মধ্যে সংবাদ বিনিময়ের যে অসুবিধা দেখা দেয়, তা দূর করবার জন্যই নূতন ভাষা-মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তখন বিভিন্ন ভাষার উপাদান মিশ্রিত হয়ে কাজ চালানো গোছের মিশ্রভাষার উদ্ভব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের চা বাগানগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত সাদরী ভাষার উদ্ভবও এই ভাবেই ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন —

'The mobility and migration of different linguistic communities in the history have created multilingual situations, where communicative needs induce formations of new languages. Pidginization in the reality is multigenetical linguistics contacts. ... In the Tea gardens of Sub-Himalayan region in West Bengal and Assam we get Sadri, a pidgin used by the Santals and Oraons. This is used in the Tea garden.[12]

কিন্তু সাদরী ভাষা যে একটি 'খিঁচুড়ী' ভাষা নয়, ছোটনাগপুর অঞ্চলের একটি আর্যমূল উপভাষা গ্রীয়ার্সনের বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। 'লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে গ্রীয়ার্সন সাদরী ভাষা সম্পর্কে বলেছেন যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচলিত নাগপুরিয়া (ভোজপুরীয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত) ভাষারই আর একটি নাম সাদানী বা সাদরী। মাগধী উপ-ভাষার সঙ্গে এই ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।[১৩] উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজাতির চা-শ্রমিকদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় জনৈক গবেষক সাদরী ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, " সাদরী তথা সাদানীর উদ্ভব ঘটেছে মাগধী প্রকৃতেরই কোনো

শুদ্ধ রূপ থেকে। অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার মত তাকেও অপভ্রংশের যুগ পেরিয়ে আসতে হয় ... এই ভাষা নিঃসন্দেহে একটি সুত-ত্র ও পূর্ণাঙ্গ আর্যমূল আধুনিক ভারতীয় ভাষা।" [১৪] সাদানী-ব্যাকরণ রচয়িতা পিটার শান্তি নওরোঙ্গি তাঁর 'এ সিম্পল গ্রামার অব সাদানী' গ্রন্থের ভূমিকায় এই ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, 'সাদানী' ভাষাই ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষা এবং আদিবাসীদের অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে এই ভাষা গ্রহণ করেছেন। [১৫] আদিবাসী শ্রমিকরা সু-ভূমিতে থাকার সময়ই যে সাদরী ভাষা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ভাষা যে বিহার অঞ্চল থেকে চা-বাগান অঞ্চলে আনীত হয়েছিল, জনৈক লেখক তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন - " চা-বাগিচা শ্রমিক কূলের ভাষাটি মোটামুটি ভাবে বিহার ঘেঁষা, বিহার হইতে আনীত ও তাহার ঐতিহাসিক কারণও প্রতীয়মান। তথাকার লোহারী, নাগেশিয়া (গ্রীয়ার্সন মতানুসারে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত-) গৌড় মূলত বিহারের নাগপুরিয়ার অন্তর্গত। [১৬]

সুতরাং বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলে ব্যবহৃত সাদরী-ভাষা একটি জগা-খিচুড়ী' বা 'মিশ্র-ভাষা' নয় এবং চা বাগান অঞ্চলেও এই ভাষার উদ্ভবও ঘটেনি, সাদরী একটি পূর্ণাঙ্গ নব্য-ভারতীয় আর্যমূল ভাষা। অবধী, ভোজপুরী, ওড়িয়া বাংলা প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে এই ভাষার সম্পর্ক আছে। ধ্বনিগত দিক থেকে সাদরী ভাষা যেমন অবধী, ভোজপুরী, মাগধী প্রভৃতি ভাষায় নিকটবর্তী, তেমনি ব্যাকরণ ও অনুয়গত দিক থেকে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ। [১৭] এই ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। **সাদরী ভাষা সম্ভবত ভোজপুরী, অবধী, মৈথিলী ভাষার মত বিহারী হিন্দীরই একটি উপভাষা।**

সাদরী ভাষার কেন্দ্রভূমি ও উৎসস্থল যে বিহার অঞ্চল এবং সেখানেই যে বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতি গুলির দ্বারা এই ভাষা গৃহীত হয়ে উত্তরবঙ্গ ও

আসামের চা-বাগান অঞ্চলে আনীত হয়েছিল, এই যুক্তি প্রধানত তিনটি কারণে সমর্থন-যোগ্য। প্রথমত, স্বদেশ ভূমিতে থাকার সময়েই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির আদিবাসীরা বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন এবং এক গোষ্ঠীর ভাষা অন্য গোষ্ঠীর কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের সামাজিক জীবন যাপনের মধ্যে প্রবাহিত ছিল এক সুগভীর ঐক্যের ফল্গুধারা। সেই ঐক্যের আকর্ষনে ও পরস্পরের মধ্যে বাক্-বিনিময়ের প্রয়োজনে তাঁরা স্থানীয় আর্যভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের গোষ্ঠী-ভাষাগুলি থেকে অনেক উন্নত ও 'প্রতিপত্তিশালী' আর্যমূল এই দ্বিতীয় ভাষাই কালক্রমে হয়ে উঠেছে তাঁদের প্রথম ভাষা।

দ্বিতীয়ত, সাদরী ভাষায় হিন্দী উপাদানের আধিক্য থেকেই অনুমান করা যায় যে, এই ভাষার উদ্ভব হিন্দী বলয়েই ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান অঞ্চলে যদি এই ভাষার উদ্ভব ঘটত, তাহলে এই ভাষায় এত বেশি পরিমান হিন্দী ভাষার উপাদান থাকা সম্ভব হত না। কারণ হিন্দী-বলয় থেকে বহু দূরবর্তী উত্তরবঙ্গ ও আসামের স্থানীয় ভাষা হিন্দী নয়, সুতরাং হিন্দী ভাষার সঙ্গে যে আদিবাসী চা শ্রমিকদের পূর্ব-পরিচয় ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্ব-ভূমিতে থাকার সময়েই আদিবাসীরা আর্যমূল সাদরী ভাষা গ্রহণ করেছিলেন বলেই এই ভাষায় হিন্দীর উপাদান এত বেশি।

তৃতীয়ত, আদিবাসী জনজাতিগুলির নিজস্ব গোষ্ঠীভাষাগুলি বাচক সংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকেও এই ভাষাগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। সাধারণত দেখা যায়,"যে সম্প্রদায় অন্যদের থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর, এবং যাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম, তাদের অন্য একটি প্রধান ভাষা শিখতেই হয় শিক্ষা ও জীবিকার প্রয়োজনে।"[১৮] এজন্যই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর আদিবাসীরা নিজেদের মাতৃভাষা ছেড়ে আর্যমূল সাদরী ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তাদের গোষ্ঠীভাষাগুলির মাধ্যমে

শিক্ষা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, অথচ জীবিকার প্রয়োজনেই বাইরের জগতে প্রবেশ না করেও তাঁদের গত্যন্তর ছিল না।

সাদরীভাষীরা মোটামুটিভাবে দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় নিজ নিজ গোষ্ঠীভাষা অথবা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা হওয়ার ফলে চা-শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। চা-শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ায় বাংলা ভাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। বর্তমানে অনেকেই বাংলা ভাষায় বাক্ বিনিময়ে অভ্যস্ত। আদিবাসী চা শ্রমিকরা অনেকে হিন্দী-ভাষাও জানেন। সাদরী ভাষা এবং

জলপাইগুড়ি জেলার মেচ, রাভা, গারো ও টোটো ভাষা সম্প্রদায়গুলি 'ভোট-বর্মী' ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। বাচক সংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকে এই ভাষাগুলি জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও সংবাদ-বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এই ভাষাগুলি সুশৃংখল নিয়মতন্ত্র ও উৎসগত পরম্পরার অধিকারী। এই ভাষাগুলিই জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন ভাষা। প্রাক্-বৃটীশ যুগে, জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের অনেক আগে থেকেই ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর এই সব উপজাতির লোকেরা এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীগুলির অনেকেই পূর্বদিকে আসাম অভিমুখে চলে গেলেও, একটি অংশ এখনও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাস করছেন। এঁদের মধ্যে মেচ ভাষাভাষীরা কয়েকটি অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে বাস করেন এবং কয়েকটি অঞ্চলে রাজবংশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করেন। সাঁতালীবস্তী, মহাকালগুড়ি, মেন্দাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে মেচভাষীরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করেন, কিন্তু রাজালীবাজনা, শিশুবাড়ী, খড়েরবাড়ী, তালেশ্বরগুড়ি, প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে তাঁরা অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীদের

সঙ্গেই বাস করেন। রাভা ভাষীদের অধিকাংশই বনবস্তীতে বাস করেন। কিন্তু বিভিন্ন বনবস্তীতে বসবাসকারী রাভা ভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুব কম। এরা বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একটি বন বস্তীতে বাস করেন। রাভা ভাষীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দক্ষিণ ও মধ্য কামাখ্যাগুড়ির গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীদের সঙ্গে বাস করেন। কিন্তু এঁরা নিজেদের মাতৃভাষা প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন, রাজবংশী ভাষাই হয়ে উঠেছে গ্রামবাসী রাভাদের 'অঘোষিত' মাতৃভাষা। এই জেলায় গারোদের সংখ্যাও খুব কম। গারোদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা ছাড়া অধিকাংশই রাভাদের মতো বনবস্তীতে বসবাস করেন। উত্তরবঙ্গে একসময় কোচ ভাষা ভাষীর সংখ্যা অন্যান্য ভোট-বর্মী ভাষা গোষ্ঠী থেকে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস ও মাতৃভাষা বর্জন করে হিন্দু ধর্ম ও বাংলা ভাষা গ্রহণ করে রাজবংশী নামে পরিচিত হয়েছেন। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কোচভাষীরা রাজবংশী ভাষীদের মধ্যে মিশে গিয়েছেন। গ্রীয়ারসন,[১৯] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,[২০] প্রমুখ পণ্ডিতেরা রাজবংশীদের ধর্মান্তরিত কোচ হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

কোচ, মেচ, রাভা ও গারো ভাষাগুলি ভোটবর্মী ভাষা পরিবারের 'আসাম-বর্মী' শাখার 'বোড়ো' গোষ্ঠীর ভাষা। এই বোড়োভাষীরা একসময় সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে একটি শক্তিশালী জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।[২১] তার ফলে বোড়ো ভাষাও ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর পূর্ব ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আসামের কাছাড়ী ভাষাও এই বোড়ো ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত, নাগা ভাষীদের সঙ্গেও বোড়ো ভাষীদের সম্পর্ক আছে। মেচ ভাষীরা বর্তমানে নিজেদের 'বোড়ো' নামে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। জলপাইগুড়ি জেলার মেচদের কাছেও 'মেচ' অভিধাটি বর্তমানে সম্মানজনক বলে বিবেচিত নয়। মেচ, রাভা ও গারো ভাষার নিজস্ব লিপি নেই। জলপাইগুড়ি জেলার মেচভাষীরা বাংলা লিপি ব্যবহার করেন। বাংলা

লিপিতেই মেচরা নিজেদের মাতৃভাষার চর্চা করে থাকেন। মেচ ভাষায় সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদপত্রও (সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার রাভা ভাষীদের মধ্যে সাহিত্য চর্চার অভ্যাস অপেক্ষাকৃত কম। এদের মধ্যে শিক্ষার হারও খুব কম। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা বাংলা লিপি ব্যবহার করেন। মেচ, রাভা, গারো প্রভৃতি ভাষা ভাষীরা মোটামুটিভাবে দ্বিভাষী, নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা জানেন। বাঙালীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। বনবস্তীর রাভারাও মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষা জানেন, কিন্তু মহিলারা এখনও বাংলা জানেন না।

টোটো ভাষা তোট-বর্মী ভাষা পরিবারের 'তোট হিমালয়ী' (**Tibeto Himalayan**) ভাষা-গোষ্ঠীর একটি শাখা। এই 'তোট হিমালয়ী' ভাষাকে হজসন্ দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছিলেন —'সর্বনাম-বিযুক্ত' (**Non-Pronominalised**) এবং 'সর্বনাময়ুক্ত' (**Pronominalised**) ভাষা রূপে।[২২] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সর্বনাম-বিযুক্ত হিমালয়ী' ভাষাকে 'বিশুদ্ধ তোট-বর্মী' (**Pure Tibeto-Burman**) ভাষা রূপে অভিহিত করেছেন।[২৩] কারণ এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি অন্যান্য ভাষার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নি। এই ভাষাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়ারূপের সঙ্গে সর্বনামীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। লেপচা, 'রং', 'আনওয়ারী', 'টোটো' প্রভৃতি ভাষাগুলি এই গোষ্ঠীভুক্ত। অন্যদিকে 'সর্বনাময়ুক্ত তোট হিমালয়ী ভাষা'গুলি অষ্ট্রিক (মুন্ডা) ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। অষ্ট্রিক ভাষার (মুন্ডা) প্রভাবে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে কিছু কিছু ব্যাকরণগত সংস্কার সাধিত হয়েছে। অষ্ট্রিক ভাষার কিছু কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও এই ভাষাগুলিতে গৃহীত হয়েছে। টোটো ভাষার বাচক সংখ্যা এক হাজারের কম এবং টোটোপাড়ায় নেপালী ভাষাভাষীরা বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ফলে টোটো ভাষায় নেপালী ভাষার প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং অনেক নেপালী শব্দ টোটো ভাষার শব্দকোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বর্তমানে টোটোভাষীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময়ও মাতৃভাষার সঙ্গে নেপালী শব্দ মিশিয়ে ব্যবহার করেন। টোটোপাড়ার প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে

বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে 'স্কুল-ফেরৎ' টোটোরা বাংলা জানেন এবং এদের মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রভাব টোটোদের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে।

নানা প্রয়োজনে টোটোদের হাণ্টুপাড়া, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করতে হয়; এর ফলে সাদরী ভাষা-ভাষী ও বাংলা ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে তাদের ভাষা-সংযোগ গড়ে উঠেছে এবং এইসব ভাষার শব্দাবলী টোটো ভাষায় গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে টোটো ভাষার শব্দকোষে অনেক শব্দ নেপালী, বাংলা ও সাদরী ভাষা থেকে প্রবেশ করেছে। তবে নেপালী শব্দই টোটোদের ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। টোটোভাষার গৃহীত (Loan words) শব্দাবলীর মধ্যে ৫০ শতাংশ নেপালী শব্দ, ৩০ শতাংশ বাংলা শব্দ এবং ২০ শতাংশ শব্দ অন্যান্য ভাষা থেকে গৃহীত।[২৪] টোটো ভাষার কোন লিপি নেই। শিক্ষিত টোটোরা মাতৃভাষা লিপিবদ্ধ করেন বাংলা লিপিতে। বাইরের জগতের সঙ্গে টোটোদের সংমিশ্রণ এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, তার ফলে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাব টোটোদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিকজীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব টোটো ভাষার ক্ষেত্রেও অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে টোটোভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বিকৃত বা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু এই জেলায় বাংলা ভাষার একটিমাত্র উপভাষিক রূপ ব্যবহৃত হয় না। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে জলপাই-গুড়ি জেলার বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে সুস্পষ্ট দুটি ভাগ আছে। এই দুটি বিভাগের একটি হল স্থানীয় রাজবংশী কথ্য ভাষা ব্যবহারকারী জনসম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টি হল বরেন্দ্রী ও বরেন্দ্রী উপভাষিক অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত বাঙালী সম্প্রদায়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা সাধারণভাবে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে 'রাজবংশীবুলি' নামে পরিচিত। গ্রীয়ার্সন এই উপভাষার নামকরণ করেছিলেন 'রাজবংশী উপভাষা'।[২৫] কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,[২৬] সুকুমার সেন[২৭] প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এই কথ্য ভাষা-রূপটিকে 'কামরূপ'

বা 'কামরূপী' উপভাষা নামে অভিহিত করেছেন। ডা: নির্মলকুমার দাসও 'কামরূপী উপভাষা' নামকরণে আপত্তি করেন নি, তাঁর আপত্তি 'রাজবংশী' নামটি সম্পর্কে। কারণ এই নামটি 'একাধারে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট' সেজন্য এই নামটি বিভ্রান্তিকর ও পরিত্যাজ্য।[২৮] রাজবংশী ভাষা সম্পর্কে গবেষক ডা: নির্মলকুমার ভৌমিক এই উপভাষার নামকরণ করেছেন - 'প্রাক্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা'। তাঁর মতে, কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর নামে "রাজবংশী" নামকরণ যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি অঞ্চলকে অবলম্বন করে 'কামরূপ' বা 'কামতা' নামকরণও ব্যাপকতা-সূচক নয়।[২৯] কিন্তু রাজবংশী বিদ্বৎসমাজ 'রাজবংশী' নামটিকেই অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে করেন। এমনকি, অনেকে এই উপভাষাটিকে বাংলা ভাষা থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্রভাষা বলেও মনে করেন। উপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে এই উপভাষাটিকে 'রাজবংশী ভাষা' নামে চিহ্নিত করেছেন।[৩০] রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক ডঃ গিরিজা শংকর রায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্য ভাষাটিকে বাংলা ভাষা থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে দাবী না করলেও, তিনি রাজবংশী নামকরণটি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন।[৩১] তবে এই উপভাষার নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক, তা সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করেনি। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এই কথ্য ভাষাটি 'রাজবংশী বুলি' নামেই সমধিক পরিচিত এবং এই রাজবংশী নামটিই সাধারণভাবে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে গৃহীত। জলপাইগুড়ি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায়, কোচবিহার, দক্ষিন দার্জিলিং, অভিবক্ত- পশ্চিম দিনাজপুর, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, আসামের গোয়ালপাড় জেলা এবং বাংলাদেশের রংপুর জেলায় এই আঞ্চলিক কথ্য ভাষাটি রাজবংশী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার মধ্যে ঠিক কতজন রাজবংশী কথ্য ভাষাটি ব্যবহার করেন, তা নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের জনগণনায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা দেখান হয়েছে ৩২৯, ১৯১ জন[৩২], কিন্তু ঐ জনগণনাতেই

রাজবংশী কথ্য ভাষার বাচক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ৬০, ০৭২ জন।[৩৩] রাজবংশী জনসম্প্রদায় ও রাজবংশী কথ্য ভাষা-ভাষীর মধ্যে সংখ্যার এই ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়, রাজবংশীদের অনেকেই রাজবংশী কথ্য ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষারূপে ঘোষণা করেননি। তবে রাজবংশী কথ্য ভাষাভাষীর নির্ভুল সংখ্যা পাওয়া না গেলেও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে এই কথ্য ভাষা ব্যবহারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারেই জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ৭২১, ৪৮৬ জন ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেছেন এই জেলার বাইরে।[৩৪] এঁদেরকে অভিবাসী (Immigrants) হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ২৩৭, ৯৮১ জন বাংলা দেশে এবং ২০১, ২৬৭ জন পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন।[৩৫] এঁদেরকে বাংলা ভাষা-ভাষী বলে ধরে নিলে জলপাইগুড়ি জেলায় মোট বহিরাগত বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩১, ২৫৬ জন। জেলার মোট বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা থেকে এই সংখ্যা বিয়োগ করলে (১০৫৪, ২৫৫ - ৪৩১, ২৫৬) স্থানীয় বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা পাওয়া যায় ৬১৪, ৯৯৯ জন। এঁদেরকে মোটামুটি ভাবে রাজবংশী কথ্য ভাষা ব্যবহারী হিসাবে ধরে নিলে মোট বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে রাজ-বংশী কথ্য ভাষা ব্যবহারকারীর আনুপাতিক হার দাঁড়ায় ৫৮.৩৩ শতাংশ। এই হার আরও বাড়তে পারে, যদি রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলা থেকে আগত রাজবংশী কথ্য ভাষাভাষীদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়। কারণ এই সব জেলা থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত অভিবাসীতের মাতৃভাষাও রাজবংশী কথ্য ভাষা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশী কথ্য ভাষার বাচক গোষ্ঠীই সংখ্যা গরিষ্ঠ। রাজবংশী ভাষাভাষীরা অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে কৃষি নির্ভর জীবন যাপন করেন। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার মোট অধিবাসীর মধ্যে ৮৫.১৬ ভাগ গ্রামবাসী। এই গ্রামবাসীদের অধিকাংশই রাজবংশী ভাষা-ভাষী স্থানীয় জনগোষ্ঠী। চলিত-মৌখিক বাংলার সংগে রাজবংশী কথ্য ভাষার পার্থক্য প্রধানতঃ উচ্চারণগত। তবে ব্যাকরণের দিক থেকেও এই কথ্য ভাষায় কিছু বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই আঞ্চলিক কথ্য ভাষাটির

অন্যতম বৈশিষ্ট্য রক্ষনশীলতা ও বিবর্তনের মন্থরগতি। প্রাচীন ও মধ্য বাংলার কয়েকটি উচ্চারণগত ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, এখনও এই ভাষায় অব্যাহত আছে। আদি-মধ্য বাংলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজবংশী কথ্য ভাষার সাদৃশ্য আছে। ভাষা বিবর্তনের এই মন্থর গতি ও রক্ষনশীলতার জন্য রাজবংশী কথ্য ভাষার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।[৩৬]

রাজবংশী কথ্য ভাষা অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ অন্যান্য জেলাগুলির কথ্য ভাষায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক কারণেই অন্যান্য জেলার কথ্য ভাষায় জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষা থেকে বেশি বিকৃতি ঘটেছে। অবস্থানগত দিক থেকে গোয়ালপাড়ার ভাষায় যেমন অসমীয়া ভাষার প্রভাব পড়েছে, তেমনি পূর্ণিয়া জেলার ভাষা হিন্দী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ভাষায় নেপালী ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। কোচ রাজাদের রাজধানী হওয়ার ফলে কোচবিহার জেলার ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি।

কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার চতুঃসীমায় অন্যান্য রাজবংশী ভাষাভাষী জেলাগুলি থাকায় বাইরের প্রভাব এই জেলার ভাষাকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারেনি। তার ফলে এই জেলার কথ্য ভাষার বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি ভাবে সুরক্ষিত আছে।[৩৭] অবশ্য ডুয়ার্স অঞ্চলের রাজবংশী ভাষা সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়। প্রাক্-বৃটীশ যুগে ডুয়ার্স অঞ্চল ভুটিয়াদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। ডুয়ার্স অঞ্চলের উত্তরে ভুটান এবং পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, এবং দক্ষিণে কোচবিহার জেলা অবস্থিত। সেজন্য এখানকার ভাষায় ভোটিয়া প্রভাব এবং কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। বোড়ো ভাষার প্রভাবও ডুয়ার্সের ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমাংশেই, অর্থাৎ তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলগুলিতেই রাজবংশী কথ্য ভাষার অবিকৃত প্রাচীন রূপটি মোটামুটিভাবে রক্ষিত আছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাগ বাংলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে আগত অভিবাসী। এই জেলার বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ ভাগই অভিবাসী। এই অভিবাসীদের মধ্যে যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা, তাঁরা অধিকাংশেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশ বিভাগ জণিত কারণে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বিভিন্ন জেলা থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় আগত। এদের মধ্যে বঙ্গালী ও বরেন্দ্রী উপভাষা-ভাষী অঞ্চলের লোকেরাই সংখ্যায় বেশি। এঁরা নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশে কথা বলার সময় পূর্ববর্তী জেলার উপভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, সভা-সমিতিতে চলিত যৌথিক বাংলা অনুসরণ করেন। আবার এঁদের মধ্যে যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, তাঁরা স্থানীয় রাজবংশীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় রাজবংশী কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। চা-বাগান অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরাও সাধারণভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলবার সময় পূর্ববর্তী জেলার উপভাষা ব্যবহার করেন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যদের সঙ্গে বাক্-বিনিময়ে চলিত বাংলা ব্যবহার করেন। সুতরাং, জলপাইগুড়ি জেলার অভিবাসী বাঙালীদের দ্বারা মোটামুটিভাবে তিন প্রকার উপভাষা ব্যবহৃত হয় - (১) পূর্ববর্তী জেলার বঙ্গালী বা বরেন্দ্রী উপভাষা, (২) চলিত-যৌথিক বাংলা ভাষা, এবং (৩) স্থানীয় রাজবংশী কথ্য ভাষা। তবে 'ওপার বাংলার' বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষা-সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে চলিত-যৌথিক বাংলা ব্যবহার করলেও, এঁদের উচ্চারণে পূর্ববর্তী উপভাষার বৈশিষ্ট্য এখনও থেকে যাওয়ার ফলে এঁদের মুখে চলিত বাংলার শব্দের উচ্চারণও কিছুটা পাল্টে গিয়েছে, তার ফলে চলিত্-যৌথিক বাংলা একটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে, যার সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গে প্রচলিত চলিত-যৌথিক বাংলার কিছু কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। স্বরাঘাত (accent) ও সুরতরঙ্গের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার ভাষিক পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই জেলার বিভিন্ন বাচক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার বাচকগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীগুলির

অধিকাংশ সদস্যই দ্বিভাষী। অন্যান্য ভাষা-ভাষীরা অধিকাংশেই বাংলা ভাষা জানেন। তবে মহিলাদের মধ্যে দ্বি-ভাষীর সংখ্যা কম। অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরা বাংলা ভাষা জানলেও বাংলা ভাষা-ভাষীরা কিন্তু দ্বিভাষী নন, তাঁরা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, কারণ বাংলা ভাষাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সরকারী ভাষা। তাছাড়া সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে অগ্রসর। শিক্ষিত বাঙালীরা অবশ্য অনেকে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা জানেন।

জলপাইগুড়ি জেলার ভাষাগত অঞ্চল বিভাগ

বহুসংখ্যক ব্যক্তির মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত এবং বৃহত্তর ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রসারিত ভাষার মধ্যে অঞ্চলবিশেষের বাক্ ব্যবহারে পার্থক্য দেখা দেয়, কারণ এক প্রান্তের লোকের সঙ্গে অন্য প্রান্তের লোকের মধ্যে যখন পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ও সংবাদ বিনিময় হ্রাস পায়, তখন একই ভাষাভাষী হলেও তাদের ভাষায় নানারকম আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এই ভাবে যখন একটি ভাষার বাচকসংখ্যা ও ভৌগোলিক বিস্তার বেড়ে গিয়ে একাধিক আঞ্চলিক ভাষারূপ গড়ে উঠে, তখন সেই ভাষা-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিকে একটি ভাষারই 'দুটো রূপ ও রীতি শিখতে হয়। একটি তাঁর নিজের অঞ্চলের ভাষা, সেটিই তাঁর যথার্থ মাতৃভাষা, আর একটি 'শিষ্ট ভাষা'। প্রথমটি তিনি ব্যবহার করেন নিজের বাড়ীর ভিতরে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, নিজের অঞ্চলের লোকজনের সঙ্গে। দ্বিতীয়টি ব্যবহার করেন শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যাবহারিক কাজ কর্মে এবং অন্যান্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গে কথাবার্তায়।[৩৮] এই যথার্থ মাতৃভাষা বা অঞ্চলে অঞ্চলে কথিত ভাষার মধ্যে যে প্রভেদ, তা যতটা ধ্বনিগত দিক থেকে, ততটা রূপগত দিক থেকে নয়। অবশ্য রূপগত ও শব্দগত পার্থক্যও অসম্ভব নয়। মানুষের সঙ্গে তার ভাষার সম্পর্ক

এমনই নিবিড় যে, ব্যক্তি-র সঙ্গে ব্যক্তি-র বাক্-ব্যবহারেও পার্থক্য থাকতে পারে। একটি বৃহদায়তন বিশিষ্ট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে, এমনকি একটি গ্রামের সঙ্গে আর একটি গ্রামের বা একটি গ্রাম-গুচ্ছের সঙ্গে অন্য একটি গ্রাম-গুচ্ছের ভাষাগত পার্থক্য গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ভাষা বিজ্ঞানী লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডের অভিমত হল -

"... there is no question of uniformity over any sizable district. Every village, or, atmost every cluster of two or three villages has its local peculiarities of speech." ৩৯

প্রত্যেকটি অঞ্চলের বাক্-ব্যবহারে এই যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ভাষার আঞ্চলিক বিভাগ বা উপভাষার ধারণা। একটি ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, সেই অনুসারে ভাষাগত অঞ্চল বিভাগ করা যায়। কিন্তু জলপাইগুড়ি একটি বহু ভাষাভাষী জেলা। 'বাংলা ভাষা' বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হলেও, আরও অনেকগুলি ভাষাও বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মাতৃভাষারূপে এই জেলায় ব্যবহৃত হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অনেকগুলি স্বতন্ত্র মাতৃভাষার ধারক রূপে (জলপাইগুড়ি জেলার ভাষাগত বৈচিত্র্য ভাষা-সম্প্রদায় ভিত্তিক, উপভাষা-ভিত্তিক নয়। তাই এই জেলার ভাষায় কোন একটি বিশেষ ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (Local peculiarities) ভিত্তিক অঞ্চল বিভাগ সম্ভব নয়। কিন্তু একাধিক মাতৃভাষা থাকলেও, একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলির ভৌগোলিক বিস্তার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নেপালী, কুরুখ-ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতালী, খারিয়া, নাগেশিয়া, হো, শবর ইত্যাদি ভাষাগুলি প্রধানত চা-বাগান অঞ্চলের নেপালী ও আদিবাসী চা-শ্রমিকদের মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষাগুলি ছাড়া সাদরী ভাষাটিও চা-বাগান অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষারূপে (Lingua-Franca) অধিকাংশ চা-শ্রমিকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।) জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলি অধিকাংশই পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত। (সুতরাং এই ভাষাগুলিও মূলত পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে

যেচ, রাভা, গারো, টোটো ইত্যাদি ভোট-বর্মী ভাষার বাচক গোষ্ঠীগুলিও পশ্চিম ডুয়ার্সের কয়েকটি বিশেষ গ্রাম, বনবস্তী এবং পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করেন। সুতরাং বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা-গোষ্ঠীগুলি মূলত জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে—পশ্চিম ডুয়ার্সেই কেন্দ্রীভূত। তিস্তানদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলে এঁদের বিশেষ দেখা যায় না। পশ্চিম ডুয়ার্সের কোচবিহার সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ রাজবংশী এবং অভিবাসী বাঙালী। সুতরাং জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমাংশে অর্থাৎ তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকের ভূখণ্ডের এবং পশ্চিম ডুয়ার্সের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত রাজবংশী সম্প্রদায় এবং অভিবাসী বাঙালী সম্প্রদায়। এঁদের মাতৃভাষা রাজবংশী কথ্য ভাষা এবং বঙ্গালী-বরেন্দ্রী উপভাষা ভিত্তিক বাংলা ভাষা। কিন্তু অভিবাসী বাঙালীরা যেহেতু ঘরে-বাইরে একই উপভাষিক রূপ ব্যবহার করেন না, এবং সংখ্যার দিক থেকেও তারা রাজবংশীদের সংখ্যা থেকে কম, সেজন্য এই দুটি অঞ্চলকে 'রাজবংশী কথ্য ভাষা-প্রধান অঞ্চল' হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু একই ভাষা-ভাষী অঞ্চলরূপে গ্রহনযোগ্য হলেও জেলার পশ্চিম অঞ্চলের কথ্য ভাষা এবং পশ্চিম ডুয়ার্সের দক্ষিণ অঞ্চলের কথ্য ভাষার মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক দূরত্ব ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির কথ্যভাষা, এবং অন্যান্য ভাষার প্রভাবেও ধীরে ধীরে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন কথ্য ভাষাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলাকে ভাষাগত দিক থেকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা সম্ভব। এই তিনটি ভাষাগত অঞ্চল হল - (১) পশ্চিম অঞ্চল, (২) উত্তরপূর্ব অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। তিস্তানদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত অঞ্চলকে 'পশ্চিম অঞ্চল' এবং পশ্চিম-ডুয়ার্সের দার্জিলিং জেলা ও ভুটান সংলগ্ন অংশটিকে 'উত্তর-পূর্ব অঞ্চল' এবং পশ্চিম ডুয়ার্সের কোচবিহার জেলা-সংলগ্ন দক্ষিণ অংশকে 'দক্ষিণ-পূর্ব' অঞ্চল' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য এই ভাষাগত অঞ্চল বিভাগ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অঞ্চল বিভাগের মত পুরোপুরি নিখুঁত নয়। ভাষাগত অঞ্চল বিভাগ কখনই

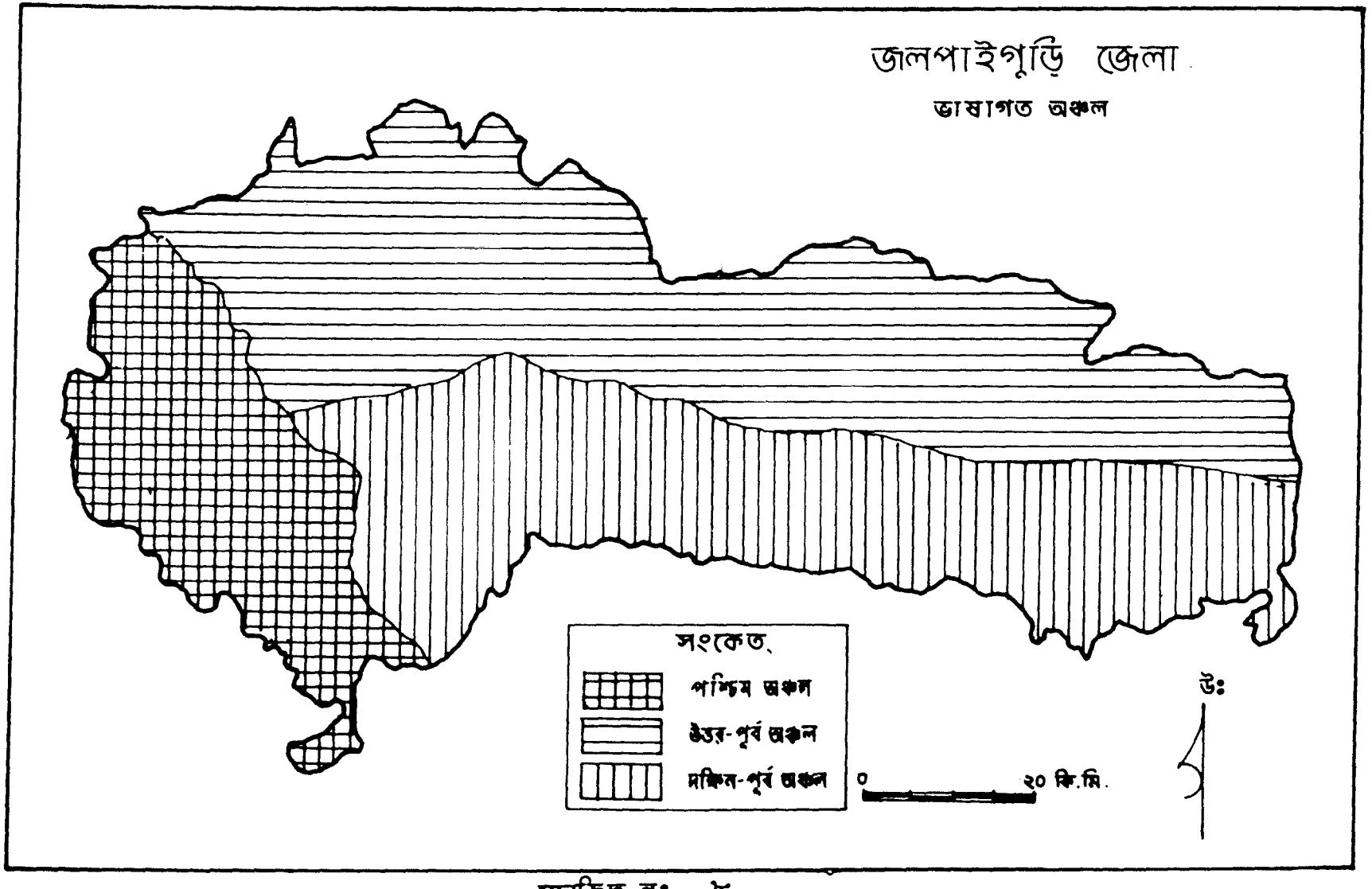

জলপাইগুড়ি জেলা
ভাষাগত অঞ্চল
সংকেত
পশ্চিম অঞ্চল
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল
দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চল
০
২০ কি.মি.
উঃ

মানচিত্র নং - ৮

সেরকম ভাবে নির্খুত হতে পারে না। কেননা, একটি ভাষাগত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অন্য অঞ্চলের মধ্যে বাহু বিস্তার করতে পারে বা কোনো একটি বিশেষ আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বাচক গোষ্ঠীর অংশ বিশেষ কোনো কারণে অন্য কোনো ভাষার এলাকায় ঢুকে যেতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলার 'দক্ষিণ-পূর্ব' ভাষাগত অঞ্চল মূলতঃ রাজবংশী কথ্য-ভাষা প্রধান অঞ্চল হলেও এই অঞ্চলের মধ্যে যে চা বাগানগুলি আছে, সেখানে প্রধান মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হয় আদিবাসী চা-শ্রমিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীভাষা এবং সাদরী ভাষা। অন্যদিকে উত্তর পূর্ব অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্য এবং চা-বাগানগুলির ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত রয়েছে রাজবংশী কথ্য ভাষা-প্রধান গ্রাম এবং আদিবাসী বাঙালী-প্রধান গঞ্জ ও বাজার অঞ্চলগুলি।

জলপাইগুড়ি জেলার উল্লিখিত তিনটি ভাষাগত অঞ্চলের পরিচয় নিম্নরূপ :-

১) <u>পশ্চিম অঞ্চল</u> :-

জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম অংশ, অর্থাৎ তিস্তানদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাজবংশী কথ্য ভাষা-প্রধান অঞ্চলটিকে ভাষাগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নাম দেওয়া যেতে পারে 'পশ্চিম অঞ্চল'। এই অঞ্চলটির উত্তর-পশ্চিমে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলা দেশের রংপুর জেলা অবস্থিত এবং পূর্ব সীমা দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি সদর থানা, রাজগঞ্জ থানা এবং ভক্তিনগর থানা। এই অঞ্চলটি চতুর্দিক থেকেই মোটামুটি ভাবে অন্যান্য রাজবংশী কথ্য ভাষাভাষী অঞ্চলের দ্বারা বেষ্টিত। অন্য ভাষার প্রভাব এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে এখানকার কথ্য ভাষায় এখনও রাজবংশী কথ্য ভাষার প্রাচীন ও অবিকৃত রূপটি সুরক্ষিত আছে।[৪০] তবে সাম্প্রতিক কালে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ভক্তিনগর থানার ডাবগ্রাম এলাকায় এবং জলপাইগুড়ি শহর ও শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আদিবাসী

বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার দ্রুত বিস্তারের ফলে স্থানীয় কথ্য ভাষার বিকৃতি ও পশ্চাদাপসরণ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মোহিতনগর, ফাটাপুকুর, ফুল-বাড়ী, মন্ডলঘাট ইত্যাদি গ্রাম-প্রধান অঞ্চলেও আধুনিক সভ্যতার ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে। রানীনগর অঞ্চলে আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে ওঠার ফলে গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ধারায় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। তার ফলে এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় মৌখিক-চলিত বাংলার আগ্রাসন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আগ্রাসনের ফলে রাজবংশী কথ্য ভাষার প্রাচীন রূপটি যে আর কতদিন অব্যাহত থাকতে পারবে, সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

২) উত্তর-পূর্ব অঞ্চল :-

তিস্তার নদীর পূর্ব উপকূল থেকে জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব সীমা দিয়ে প্রবাহিত সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি সাধারণভাবে পশ্চিম ডুয়ার্স নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম অংশের সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের অনেক ব্যবধান আছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পশ্চিম ডুয়ার্স যেন একটি স্বতন্ত্র এলাকা। আবার পশ্চিম ডুয়ার্সেরই পাহাড় সংলগ্ন উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিনাংশের পার্থক্য আছে। উত্তরাংশ প্রধানত চিরহরিৎ অরণ্যে পরিপূর্ণ এবং জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ চা-বাগানগুলি এই অঞ্চলেরই অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ অংশ সাধারণভাবে কৃষিযোগ্য সমভূমি। দুই অঞ্চলের অধিবাসী ও ভাষিক পরিস্থিতির মধ্যেও পার্থক্য আছে । এই সব কারণে পশ্চিম ডুয়ার্সের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশকে দুটি পৃথক ভাষাগত অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অবশ্য এই বিভাজন কোন প্রশাসনিক সীমানার দ্বারা নির্ধারিত নয়। তিস্তার পূর্বতীর থেকে পূর্বে সংকোশ নদী পর্যন্ত পশ্চিম ডুয়ার্সের মাঝ বরাবর একটি 'কাল্পনিক মধ্য রেখা' (Middle line) টানলে যে দুটি ভূখন্ড পাওয়া যায়, সেইভূখন্ড দুটির উত্তরের অংশকে ভাষাগত দিক থেকে 'উত্তর-পূর্ব অঞ্চল' এবং দক্ষিণের অংশটিকে 'দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল' নাম দেওয়া হয়েছে।

ভাষাগত 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের' উত্তরে দার্জিলিং জেলা এবং ভুটান, পূর্বে সংকোশ নদী তথা আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমে তিস্তা নদী এবং দক্ষিণে পূর্বোক্ত কল্পিত 'মধ্য-রেখাটি।' এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে মাল, মেটেলী, নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া, মাদারীহাট, জয়গাঁ ও কালচিনি থানাগুলির সম্পূর্ণ অংশ এবং কুমারগ্রাম থানার উত্তর অংশ অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্যে যে ভাষাগুলি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হল, হিন্দী, নেপালী, কুরুখ-ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতালী, খারিয়া, নাগেশিয়া প্রভৃতি চা-বাগান অঞ্চলের আদিবাসী শ্রমিকদের ভাষাগুলি, এবং মেচ, রাভা, গারো, টোটো, প্রভৃতি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। এই ভাষাগুলি ব্যতীত চা-বাগান অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্যবিধায়ক ভাষারূপে কথিত সাদরী ভাষাটিও এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য কথ্য ভাষা। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষাগুলির জন্যই জলপাইগুড়িকে একটি 'বহু ভাষা-ভাষী জেলা' বলা যায়। তবে অনেকগুলি কথ্য ভাষার অস্তিত্ব থাকলেও সাদরী ভাষাকেই উত্তর পূর্ব অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষা বলা যায়। কারণ চা-বাগান অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতি শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীভাষা থাকলেও, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা সাদরী ভাষাই ব্যবহার করেন।

তবে চা-বাগান অঞ্চলের আদিবাসী শ্রমিক শ্রেণী, মেচ, রাভা, গারো, টোটো ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর লোকেরা অধিকাংশই বাংলা ভাষা জানেন। সেদিক থেকে তাঁরা অনেকেই দ্বিভাষী।

৩. দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল

পূর্বোক্ত মধ্য রেখার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী পশ্চিম ডুয়ার্সের দক্ষিনাঞ্চলকে ভাষাগত দিক থেকে 'দক্ষিণ-পূর্ব' অঞ্চল বলা হয়েছে। এই অঞ্চলের উত্তরে পূর্বোক্ত মধ্যরেখা, পূর্বে

সংকোশ নদী তথা আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা এবং পশ্চিমে তিস্তা নদী। ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, ও আলিপুরদুয়ার থানাগুলির সম্পূর্ণ অংশ এবং কুমারগ্রাম থানার দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজবংশী কথ্য ভাষাই এই অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষা। তবে আলিপুরদুয়ার পৌর শহর, শোভাগঞ্জ, ময়নাগুড়ি ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিষা ইত্যাদি অপৌর শহর ও গঞ্জগুলিতে অভিবাসী বাঙালীদের সংখ্যা যথেষ্ট। এই অঞ্চল প্রাক্-বৃটীশ যুগে ভুটিয়াদের অধিকারে ছিল এবং সেজন্য এখানকার কথ্য ভাষায় ভুটিয়া ভাষার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বোড়ো ভাষার প্রভাবও এই অঞ্চলের ভাষায় অপেক্ষাকৃতভাবে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা থেকে বেশি। কোচ-বিহার জেলার কথ্য ভাষাও এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। এই অঞ্চলের রাজবংশী ভাষীদের মধ্যে অনেকেই রংপুর ও কোচবিহার জেলা থেকে আগত। কম খাজনায় প্রচুর পতিত জমির আকর্ষণে কোচবিহার, রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা থেকে এই অঞ্চলে জনসমাগম ঘটেছিল। এইসব কারণে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের রাজবংশী কথ্য ভাষার সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলের রাজবংশী কথ্য ভাষার দু-একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যগুলি প্রধানত ধ্বনিগত ও রূপগত।

জলপাইগুড়ি জেলার 'পশ্চিম অঞ্চল' ও 'দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের' রাজবংশী কথ্য ভাষার মধ্যে যে সব আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি নিম্নরূপ :-

ধ্বনিগত পার্থক্য :-

১. পশ্চিম অঞ্চলের রাজবংশী কথ্য ভাষায় পদের আদিতে /আ/ উচ্চারিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব-অঞ্চলে আ > অ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন -

পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল
আচানক্	অচানক্

পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল
আকুয়ারী	অকুয়ারী
আকাল	অকাল

২. পদের আদিতে 'র' থাকলে পশ্চিম অঞ্চলে র > অ রূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই র > 'ন' হয়। যেমন,

রক্ত- > অক্ত-	নক্ত-
রাজা > আজা	নাজা
রাতি > আতি	নাতি

৩. পশ্চিমাঞ্চলে পদ মধ্যস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এই পদমধ্যবর্তী মহাপ্রান ধ্বনি অল্পপ্রান ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন -

আনধার্	আন্দার
এখেটা	একেটা
লাঠি	নাঠি
এঠে	একে

৪. পশ্চিম অঞ্চলে পদ মধ্যবর্তী /এ/ ধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কখনো কখনো এ > অ্যা ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন -

যাবেন	যাব্যান
করিবেন	করিব্যান

৫. পদমধ্যবর্তী সামাঙ্গিক ব্যঞ্জন কখনো পশ্চিম অঞ্চলের ভাষার একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, অথবা দুই ব্যঞ্জনের মাঝখানে সামান্য বিরতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই পদমধ্যবর্তী সামাঙ্গিক ব্যঞ্জন রক্ষিত। যেমন -

পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল
পতি দিন	পত্তি দিন
পইন্ যশায়	পশ্নি যশায়
যদ্-দূর	যদ্দুর
ডেকুয়া	ডেক্কুয়া

রূপগত পার্থক্য :

১. বহুবচন বোধক রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিম অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন -

চ্যাংরা গুলা	চ্যাংরা গিলা
ধান্লা	ধান্গিলা
হালুয়ার ঘ'	হালুয়ার ঘর

২. কারক চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়।যেমন -

২য়া বিভক্তি-	গরীবক	গরীবোক
৩য়া ''	মোক দি	মোক দিয়া
৫মী ''	তোরঠে তকা	তোরটে থাকি

৩. উত্তম পুরুষ কর্তায় সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপে পশ্চিমাঞ্চলে -উঁ যুক্ত হয়, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ক্রিয়াপদের উচ্চারণে আনুনাসিক - অঁ যুক্ত হয়। যেমন -

মুই জাউ	(আমি যাই)	মুই জাঅঁ

৪. ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ গঠনে দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য আছে। পশ্চিম অঞ্চলে এক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে -অ, বা -উ যুক্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অতিরিক্ত একটি কালবাচক রূপমূল যুক্ত হয়। যেমন -

পশ্চিম অঞ্চল		দক্ষিণ-পূর্ব-অঞ্চল
মুই যাছ~যাছু	(আমি যাচ্ছি)	মুই যাবার ধছু
তুই যাচ্ছিস্	(তুমি যাচ্ছ)	তুই যাবার ধচ্ছিস্
অয় যাছে	(সে যাচ্ছে)	উয়ায় যাবার ধইচ্ছে

৫. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বহুবচন, সম্ভ্রমার্থক একবচন ও বহুবচন এবং প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়াপদের গঠনে ভবিষ্যৎ কালবোধক প্রত্যয় '-ব', -ইব' > '-য' রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে এই পরিবর্তন ঘটে না। যেমন -

তয়রা কোঠে যাবেন	তয়রা কোটে যায়েন
তয়রা আসিবেন	তয়রা আসিয়েন
তয়রা করিবেন	তয়রা করিয়েন

৬. -ইবার, যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠনে পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য আছে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে - এই প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'র' উচ্চারিত হয় না। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে 'র' উচ্চারিত হয়। যেমন -

করিবার	করিবা
আসিবার	আসিবা
খাবার	খাবা
যাবার	যাবা

৭. সর্বনাম পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে দু-একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন -

পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল	
হাম্‌রা	হামেরা	(আমরা)
অয়	উয়ায়	(সে)
হুয়ায়	উয়ায়	(তার)

৮. সম্বোধনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে 'গে' (গো) সম্বোধনটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে এই সম্বোধনটি শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

নির্দেশিকা (References)

১. Ray, B.K., 'W.B. District Census Hand Book, Jalpaiguri district, 1961, Calcutta, Govt. of W.Bengal, 1964, p.45

২. Govt. of W.Bengal, 'District Census Handbook, Jalpaiguri district, 1971, Calcutta, Directorate of Census operation, Part B, p.90-95.

৩. বিভিন্ন ভাষার বাচক সংখ্যার পরিসংখ্যানগুলি ১৯৭১ সালের জনগণনা থেকে গৃহীত করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের জনগণনায় বিভিন্ন মাতৃভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার উল্লেখ করা হয় নি। ১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্য এখনও প্রকাশিত হয় নি।

৪. 'W.B. Dist. Census Hand book' - 1971. Op.cit., p.90-91.

৫. চক্রবর্তী, সমীর, 'উত্তর বঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি,' কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৯২, অক্টোবর, পৃ.৩

৬. দাশ, শিশির, 'ভাষা জিজ্ঞাসা,' কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৯২, পৃ.৩৭

৭. দাস, নির্মল, 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে,' কলিকাতা, ওরিয়েন্টাল বুক, ১৯৮৪, পৃ.৬-৬

৮. Kusari, A.M. and others, 'W.B. District Gazetteers,' Jalpaiguri district - 1981, Calcutta, Govt. of W.Bengal, 1981, p.79.

৯. Kar, R.K., 'The Savaras of Mancotta, New Delhi, Cosmo Publications, 1981, p.72.

১০. পাল, অনিমেষ, 'পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও তাদের আন্ত সম্পর্ক', শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পাঃ), 'পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা,' কলিকাতা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, প.বঙ্গ সরকার, ১ম খন্ড, ১৯৭৭, পৃ.১৫০

১১. Das, A.K., 'Hand Book of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal', Bulletin, C.R.I. Spl. Series No.8, Calcutta, Govt. of W. Bengal p.22, 140.

১২. Sengupta, Sunil, "Multilingualism and Multilingual Communication : Field in East and North Eastern Himalayan Region." Centre for Himalayan Studies, North Bengal University, Spl. Lecture XI, Raja Rammohonpur, No Date, p.67.

১৩. Grierson, G.A., 'Linguistic Survey of India,' Reprint, Delhi, Motilal Banarasidas, 1967, Vol.V, Part II, p.277.

১৪. চক্রবর্তী, সমীর, 'আদিবাসী চা শ্রমিকের ভাষা সাদরী', অজিতেশ ভট্টাচার্য(সম্পা:) মধুপর্ণী, ২৩ বর্ষ, শারদা সংখ্যা, বালুরঘাট, ১৩৯৬, পৃ.১২

১৫. Mukherjee, S.N., 'Sadani : The Tribal diatect of Sundarbans,' Bulletin, C.R.I, Sp. Series No.8, Calcutta, C.R.I., Govt of West Bengal 1964, p.48.

১৬. সিংহ রায়, প্রনবেশ, 'পূর্ব ভারতীয় ভাষার প্রেক্ষাপট', শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা:) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৫৭

১৭. Nowrangi, P.S.,A simple Sadani grammar (1956), quated Mukherjee, S.N., op.cit., p.48.

১৮. দাশ, শিশির পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩৬

১৯. Grierson, G.A., Op.cit., Vol.V, Part-I, p.163.

২০. Chatterjee, S.K., 'Kirata Jana-Kriti', (2nd edn.) Calcutta, The Asiatic Society, 1974, p.112.

৩৬. দাস, নির্মল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩১

৩৭. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা,' কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ.২২

৩৮. দাশ, শিশির, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৩২

৩৯. Bloomfield, L., 'Language' Reprint, Delhi, Motilal Banarasidas, 1963, p.325.

৪০. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.২২

— o —